International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
Impact Factor: 6.8
Volume-XII, Issue-II, March 2026, Page No. 312-319
Published by Scholar Publications, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com
DOI: 10.29032/ijhsss.vol.12.issue.02W.225

তিব্বতী সাহিত্যের উপর মহাযান 'অবদান-কল্পলতা' গ্রন্থের প্রভাব

ঋতিমান দাস
গবেষক, ইন্দো-তিব্বতীয় অধ্যয়ন বিভাগ, বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Received: 24.03.2026; Accepted: 27.03.2026; Available online: 31.03.2026
©2026 The Author(s). Published by Scholar Publication. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

The Bodhisattva Avanadān-Kalpalatā, written by the Kashmiri scholar Kshemendra (c. 990 AD–1070 AD), is an outstanding work of Sanskrit Buddhist literature. It is a collection of legendary biographies of Bodhisattvas, each chapter of which beautifully describes the qualities and character of the Buddha and Bodhisattvas. The Avanadāna-Kalpalatā and many other Mahayana texts have been translated into Chinese, Tibetan and Mongolian. This article briefly discusses the influence of the original Sanskrit Buddhist texts on Indian and foreign literature and religion, their significance and preservation.

Keywords: Avadāna-Kalpalatā, Kshemendra, Mahayana Buddhism, Sanskrit Buddhist Literature, Cultural Transmission

ভূমিকা:

প্রাচীন বৈদিক যুগ থেকে বর্তমান কাল অবধি সংস্কৃত বাঙময়ে বিবিধ বিষয় নিয়ে বহু সংস্কৃত গ্রন্থ ও শাস্ত্রের রচনা হয়েছে। এরমধ্যে ধর্ম, দর্শন, বেদ, বেদাঙ্গ, উপনিষদ, মহাকাব্য ইত্যাদি ভারতীয় সাহিত্য আজও জগৎ খ্যাত। এ ছাড়া, বৌদ্ধ, জৈন আদি প্রাচীন ভারতীয় শ্রমণ গ্রন্থও বিপুল পরিমাণে সংস্কৃত ভাষায় উপলব্ধ ছিল এবং আজও আছে। মহাযান বৌদ্ধ বাঙময়ে প্রধানত সংস্কৃত ভাষাতেই রচিত হয়েছিল। সুতরাং, বৌদ্ধ ধর্মের মৌলিক শিক্ষাগুলির সম্বন্ধে অবগত হওয়ার জন্য সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ঐ কারণেই ১৯ ও ২০ শতকের ভারতীয় সংস্কৃত পণ্ডিতরা যেমন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (১৮৫৩-১৯৩১), সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ (১৮৭০-১৯২০), বিধুশেখর শাস্ত্রী (১৮৭৮-১৯৫৭), প্রবোধ বাগচি (১৮৯৮-১৯৫৬), নলিনাক্ষ দত্ত (১৮৯৩-১৯৭৩) প্রভৃতিরা ঐসব গ্রন্থের উপর গবেষণা এবং বহু হারিয়ে যাওয়া গ্রন্থের পুনরুদ্ধারে প্রয়াস করেন। সংস্কৃত সাহিত্য প্রায় সমান রূপেই বিদেশী পণ্ডিতদের মাধ্যমে যেমন উইলিয়াম জোন্স (১৭৪৬-১৭৯৪) ম্যাক্স্ মুলার (১৮২৩-১৯০০), মরিস উইন্টারনিট্স (১৮৬৩-১৯৩৭), সিলভ্যাঁ লেভি (১৮৬৩-১৯৩৫), লুই ডে লা ভায়ে পুসা (১৮৬৯-১৯৩৮) দের দ্বারা পশ্চিমেও প্রসারিত হয়।

প্রাচীনকালেও ভারতবর্ষের চতুর্দিকে ভারতের সাংস্কৃতিক প্রচার হয়। বিশেষ করে মৌর্য সম্রাট অশোকের আদেশানুসারে বৌদ্ধ ভিক্ষু প্রচারকরা মধ্য-এশিয়া, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, সিংহল, এমনকি পূর্ব-আফ্রিকাতেও সদ্ধর্মের প্রচারে রত হন। তাঁর রাজত্বকালেই বিভিন্ন বৌদ্ধধর্মানুলম্বীদের মধ্যে দার্শনিক সিদ্ধান্তের অমিল হওয়ায় বিভাজন শুরু হয়ে মোট আঠারটি সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়। পরবর্তীকালে, শুঙ্গ সাম্রাজ্যের মধ্যভারতে বিস্তার ঘটায়, ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রভাব বেড়ে যায়। বহু বৌদ্ধ মগধ অঞ্চল ত্যাগ করে ভারতের পশ্চিমাঞ্চল ও দাক্ষিণাত্যের দিকে

প্রস্থান করেন। ড. সুকোমল চৌধুরীর মতানুসারে, উত্তর-পশ্চিম ভারতে স্থানান্তরিত বৌদ্ধরা পরবর্তীকালে কুষানরাজ কনিষ্কের রাজত্যকালে সর্বাস্তিবাদী ও সৌত্রান্তিক সম্প্রদায়ে প্রচারিত হন। এই সর্বাস্তিবাদীরাই পরে বৈভাষিক নামে পরিচিত হন[১]। আদি স্থবিরবাদ দর্শনের থেকে উক্ত দুই সম্প্রদায়েরই সিদ্ধান্তের কিছু সূক্ষ্ম অমিল ছাড়া বিশেষ পরিবর্তন না থাকায় তাদের স্থবিরবাদ বৌদ্ধ ধারার অন্তর্গত মনে করা হয়। অন্যদিকে দাক্ষিণাত্যে স্থানান্তরিত বৌদ্ধরা প্রধানত দুই সম্প্রদায়ে বিভাজিত হন- মাধ্যমিক ও যোগাচার। এই উভয় সিদ্ধান্তই মহাযান বৌদ্ধ ধারার অন্তর্গত।

মহাযান বৌদ্ধ ধর্মের উদ্ভব সাধারণত প্রথম শতক থেকে, বিশেষ করে শূন্যতা দর্শনের প্রবর্তক আচার্য নাগার্জুন কৃত বলে মান্য করা হয়। সেই ধর্মই পরে পরিব্রাজক ও ব্যাপারীদের মাধ্যমে হিমালয়য়ে, চীনে ও উত্তর-পুর্ব এশিয়ায় ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়। তবে তিব্বতে সদ্ধর্মের প্রচার ভারতীয় মহাযান ধর্মের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত।

তিব্বতে বৌদ্ধ ধর্মের প্রচার:

তিব্বতের ইতিহাস অনুসারে, ৭ম শতাব্দীতে তিব্বতের ৩৩তম সম্রাট ও প্রথম ধর্মরাজ স্রোংচেন গাম্পোর রাজত্বকালে বৌদ্ধধর্ম তিব্বতে প্রবেশ করে। এমনকি বলা হয় যে ৭ম শতাব্দী পর্যন্ত তিব্বতের নিজস্ব কোন লিপিও ছিল না। সম্রাট স্রোংচেন গাম্পো (খ্রিঃ ৬১৭–৬৯৮)[২] নেপাল ও চীনের রাজকন্যাদের সাথে বিবাহ হয়েছিল[3]। উভয় রাজকন্যাই তাঁদের সঙ্গে করে বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্ব মৈত্রেয়ের মূর্তি ও অন্যান্য পূজার সামগ্রীও নিয়ে এসেছিলেন। সম্রাট তিব্বতে জো-খাং বা রাসা-ঠুলনাং এবং রামোছে মন্দির নির্মাণ করেন। তিব্বতী জনগণের উপাসনার জন্য বুদ্ধ ও মৈত্রেয় বোধিসত্ত্বের মূর্তিগুলি সেখানে স্থাপন করেন। মন্দিরগুলি স্থাপন করায় সম্রাটের সারা তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করার স্বপ্ন ও লক্ষ উভয়ই আরও প্রবল হয়ে ওঠে।

রাজা তাঁর মন্ত্রী থোনমি সাম্ভোট এবং ১৬ জন মেধাবী যুবককে ভারতে পড়াশোনার জন্য পাঠান। তিব্বত থেকে ভারতে আসার দুর্গম পথে বিভিন্ন বাধা এবং ভারতের সমতল ভূমির প্রবল তাপ সহ্য না করতে পারায় তাদের মধ্যে বেশীরভাগ যুবকই যাত্রা কালীন মারা যান বা তিব্বতে ফিরে যান। যাত্রীদের মধ্যে একমাত্র থোনমিই সব বাধা অতিক্রম করে, ভারতের বিভিন্ন বিদ্যাস্থানে শিক্ষা লাভ করতে সক্ষম হন। ভারতে তিনি ব্রাহ্মণ লিপিদত্ত বা লিপিকারের সংস্পর্শে এসে ব্যাকরণ, প্রমাণবিদ্যা, কাব্যবিদ্যা ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণ করেন। তিব্বতী ঐতিহাসিক গ্রন্থ অনুযায়ী তিনি দেববিদ্যা সিংহ নামক এক পণ্ডিতের কাছেও ভারতীয় জ্ঞান পরম্পরার বিভিন্ন শাখার ওপর শিক্ষা লাভ করেন। ভারতের বিভিন্ন স্থলে ভাষা ও বৌদ্ধ ধর্মের উপর অধ্যয়ন করে প্রায় সাত বছর পর থোনমি তিব্বতে ফিরে আসেন এবং সর্ব প্রথম তিনি তিব্বতী লিপি 'উচেন' নির্মাণ করেন এবং পরে সংস্কৃত ব্যাকরণের উপর ভিত্তি করে আটটি তিব্বতী ব্যাকরণ গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি ভারত থেকে বৌদ্ধ দর্শনের উপর কিছু গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থও সঙ্গে করে নিয়ে আসেন, যেগুলি তিনি নেপালি এবং ভারতীয়

---

[১] Chaudhury, S. (2021). *Gautam Buddher Dharma o Darshan*. Kolkata: Mahabodhi Society. p.p.- 326.

[২] তিব্বতী ঐতিহাসিক গ্রন্থ যেমন '*ছোয়ে জুং খে পে গা তোন* আদি গ্রন্থ এবং তিব্বতীবিদদের মতে সম্রাট স্রোংচেন গাম্পোর সময় কাল সাধারণত খ্রিঃ ৬১৭ – ৬৯৮ মানা হয়। যদিও তুন-হুয়াং এর পাওয়া পাণ্ডুলিপি এবং প্রখ্যাত তিব্বতী পণ্ডিত ও পর্যটক গেনদুন ছোয়েফেল-এর মতের স্রোংচান এর সময়কাল হল খ্রিঃ ৬১৭ – ৬৫০।

[৩] সম্রাট স্রোংচেন গাম্পোর সঙ্গে নেপালের রাজা অংশুবর্মণের কন্যা ভৃকুটির বিবাহ হয়েছিল। পরবর্তীকালে সম্রাট স্রোংচেন যখন চীনের তাং সাম্রাজ্য আক্রমণ করেন, তখন তাং সম্রাট তাই-ৎসুং শান্তি স্থাপনের জন্য তাঁর কন্যা ওয়েং চেনের সঙ্গে স্রোংচেন গাম্পোর বিবাহ করান।

পণ্ডিতদের সহযোগিতায় তিব্বতী ভাষায় অনুবাদ করেন[৪]। রাজা স্রোংচ্যান-গাম্পো থোনমি সাম্ভোটের কাছে তিব্বতী ভাষা, বৌদ্ধ দর্শন ও তার আধ্যাত্মিক অনুশীলনগুলির শিক্ষা লাভ করেন। পরে, রাজা তাঁর প্রজাদের কাছেও বৌদ্ধ ধর্মের প্রচার করেন এবং তাদের বৌদ্ধ ধর্মের মৌলিক শিক্ষাগুলি সারা তিব্বতে বিস্তার করার জন্য আদেশ দেন। রাজা স্রোংচ্যান গাম্পোকে তাঁর বীরত্ব, রাজ্য সুশাসনের ও তাঁর প্রজাদের প্রতি করুণা ও ধর্মপালনের জন্য পরবর্তীকালে বোধিসত্ত্ব অবলোকিতেশ্বরের অবতার হিসাবে স্বীকৃত করা হয়। তাঁর সময়কাল থেকেই মূল সংস্কৃত গ্রন্থ থেকে তিব্বতী ভাষায় অনুবাদ করার রীতি শুরু হয় যার পরিমাণ বর্তমানে বিপুল।

তিব্বতে বৌদ্ধ ধর্মের ইতিহাস থেকে এটা সহজেই অনুমান করা যাচ্ছে যে তিব্বতী ভাষার ওপর সংস্কৃত সাহিত্যের কি প্রবল প্রভাব আছে। শুধু তিব্বতীই নয়, যেখানে-যেখানে মহাযানী বৌদ্ধ ধর্মের প্রচার হয়েছিল, যেমন ভুটান, মঙ্গোলিয়া, লাদাখ, সিকিমের মতন বহু হিমালয়ের স্থানেও সংস্কৃত সাহিত্য ও ব্যাকরণের প্রভাব দেখা যায়। সংক্ষেপে, আমরা বলতে পারি যে সংস্কৃত সাহিত্য ও ভাষার বিশ্ব সাহিত্যে এক অবিস্মরণীয় অবদান রেখেছে। সংস্কৃত সাহিত্য কেবল বিশ্বের এক অমূল্য সম্পদই নয়য়, বরং একটি অতুলনীয় রত্নও। এটি বিশ্বের অনেক সাহিত্যের জননীও বলে মনে করা হয়।

মহাযান বৌদ্ধ সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয়:

সংস্কৃত সাহিত্য বিশ্বের অন্যতম সমৃদ্ধ সাহিত্য। মহাযান বৌদ্ধ বাঙময় মোট পাঁচটি প্রধান শাখা এবং পাঁচটি গৌণ শাখাতে অন্তর্ভুক্ত করে। পাঁচটি প্রধান শাখাই মহাযানিদের অনুসারে 'পঞ্চ মহাবিদ্যা'। 'পঞ্চ মহাবিদ্যা'-এর পাঁচটি শাখা হল- ১। শব্দ বিদ্যা, ২। শিল্প-বিদ্যা, ৩। চিকিৎসা বিদ্যা, ৪। প্রমাণ ও ৫। আধ্যাত্মিক বিদ্যা। '*মহোপায়কৌশলপ্রত্যুপকারসূত্র*[৫] নামক মহাযানী সূত্র অনুসারে শাক্যমুনি বুদ্ধ স্বয়ং এই পঞ্চমহাবিদ্যার সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। উক্ত সূত্রে ভগবান বুদ্ধ বলেছেন যে বৌদ্ধসত্ত্বগণকে অনুত্তর (সর্বোচ্চ) বোধিজ্ঞান লাভ করতে হলে উক্ত পঞ্চ মহাবিদ্যায় পারদর্শী হতে হবে। এ ছাড়া মৈত্রেয়নাথের '*মহাযানসূত্রালঙ্কার*', নাগার্জুনের '*প্রজ্ঞাদণ্ড* আদি বৌদ্ধ শাস্ত্রেও পঞ্চ মহাবিদ্যার তাৎপর্য ও আবশ্যকতার সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

পঞ্চ মহাবিদ্যার মধ্যে সর্বপ্রথম 'শব্দ বিদ্যার' গণনা করা হয় এবং শব্দ সম্পর্কিত ভ্রম এবং ত্রুটি দূর করতে এই বিদ্যার প্রয়োজন হয়। এর অর্থ হল সাময়িকভাবে এই বিদ্যার অধ্যনের মাধ্যমে সংস্কৃত, পালি, বাংলা আদি ভাষায় পাণ্ডিত্য অর্জন করা, সর্বধর্মের নিরুক্তিতে দক্ষতা অর্জন ক'রে অন্যের অপবাদ এবং অহংকারকে পরিহার করতে, শব্দের সমার্থক শব্দে দক্ষ হয়ে শব্দের ব্যাখ্যা এবং টীকা রচনায় কুশল হতে আর সর্বশেষে চার প্রতিসংবিদ জ্ঞানে[৬] পাণ্ডিত্য অর্জন করতে সক্ষম হওয়া যায়। তথাগত বুদ্ধ '*মহোপায়কৌশলপ্রত্যুপকারসূত্র*-এ বলেছেনঃ "বোধিসত্ত্বকে শব্দবিদ্যা সম্পর্কিত শাস্ত্রের অধ্যয়ন কেন করা উচিত? বোধিসত্ত্বকে শব্দের অর্থকে সঠিকভাবে বুঝতে এবং উপলব্ধি করতে আর শব্দ এবং বাক্যে অলঙ্কৃত করায় দক্ষতা অর্জন করতে শব্দবিদ্যা সম্পর্কিত শাস্ত্রের অধ্যয়ন করা উচিত।" এছাড়াও যখন কোন ব্যক্তি শব্দবিদ্যার সঠিক জ্ঞান অর্জন করে তখন তার মধ্যে উৎপন্ন অহংকারের কারণে মিথ্যাদৃষ্টি জাগে। এই ধরণের সত্ত্বদের দমন করার কৌশল শব্দবিদ্যার মাধ্যমে অর্জন হয়। 'সূত্রালঙ্কারের' টীকায় ব্যাখ্যা করা হয়েছে:

---

[৪] ভারতীয় সংস্কৃত বৌদ্ধ গ্রন্থ অনুবাদে থোনমি সাম্ভোটকে সহায়তা করেছিলেন তাঁর শিষ্যরা যেমন, ধর্ম কোষ, লহালুং দোর্জে পেল ইত্যাদি তিব্বতী অনুবাদক এবং ভারতীয় ও নেপালি পণ্ডিতরা যেমন, কুসর, ব্রাহ্মণ শঙ্কর, কাশ্মীরি পণ্ডিত তনু, নেপালি পণ্ডিত শীল মঞ্জু ও চৈনিক পণ্ডিত হাশাং।

[৫] *মহোপায়কৌশলপ্রত্যুপকারসূত্র* নামক গ্রন্থটি বর্তমানে তিব্বতী ভাষায় বুদ্ধ বচন সংগ্রহ 'কাঞ্জুর' এর উপলব্ধ আছে।

[৬] চার প্রতিসংবিদ জ্ঞান- ধর্মপ্রতিসংবিদজ্ঞান, নিরুক্তিপ্রতিসংবিদজ্ঞান, অর্থপ্রতিসংবিদজ্ঞান এবং প্রতিভাপ্রতিসংবিদজ্ঞান।

"বোধিসত্ত্বদের শব্দবিদ্যার প্রতি আগ্রহ থাকা উচিত। এর কারণ হল যখন একজন ব্যক্তি শব্দবিদ্যার উপর পাণ্ডিত্য অর্জন ক'রে ফেলেন, তখন অন্যান্য পণ্ডিতরা তাকে বিশ্বাস করেন এবং সম্মান করেন। শব্দবিদ্যা সম্পর্কিত গ্রন্থ বিষয়ে সঠিক জ্ঞান অর্জন হলে তিনি অ-বৌদ্ধ অভিভূত করতে সক্ষম হয়ে ওঠেন যারা শব্দবিদ্যার কারণে অহংকারী হন। এর সাথে শব্দ ভান্ডারের পাশাপাশি তাদের নিরুক্তি সম্পর্কেও জ্ঞান অর্জন করতে সক্ষম হন। সাধারণতঃ অক্ষর হল সমস্ত শিক্ষা এবং সিদ্ধান্তের আধার। অক্ষর দ্বারা নামের গঠন হয়, নাম থেকে শব্দ এবং শব্দ দ্বারা তৈরী হয় বাক্য বা অভিব্যক্তি। এইভাবে যেকোন গ্রন্থ, কাব্য, সিদ্ধান্ত ইত্যাদির আধারই হল অক্ষর। তথাগত বুদ্ধের বর্তমান শাসন সংগ্রহ আগম এবং অধিগমরূপে সংরক্ষিত আছে। যে শাসন বর্তমানে গ্রন্থরূপে সংরক্ষিত আছে তাকে বলা হয় আগম-শাসন। অন্যদিকে এই আগম-শাসনের শ্রবণ, চিন্তন, মনন এবং ভাবনার পরিণামস্বরূপ সাধকের মনে যে নিশ্চয়তা জাগে তাকেই অধিগম-শাসন বলা হয়। এইভাবে আমরা যদি দেখি তাহলে বুঝতে পারব অধিগম শাসন অর্থাৎ নিয়ত-জ্ঞানের উৎস একপ্রকার অক্ষরকেই মেনে নেওয়া হয়।

শব্দ বিদ্যার মধ্যে পাঁচটি গৌণ বিদ্যা অন্তর্গত যা হল- কবিতা, নীতিশাস্ত্র, ছন্দ,নাটক ও জ্যোতিষশাস্ত্র। জগতের এমন কোনও বিদ্যার বিষয় নেই যা উপরে উল্লিখিত দশটি বিষয়ের বাইরে অন্তর্ভুক্ত। সংক্ষেপে, এটা বলা যেতে পারে যে সমস্ত ধরণের বিদ্যার বিষয় বা বিদ্যাস্থান সংস্কৃত ভাষার রচিত হয়েছিল। তাই সংস্কৃত সাহিত্য বিশ্বের সমস্ত জ্ঞান পরম্পরার মধ্যে অন্যতম প্রধান একটি বিষয়।

সংস্কৃত বৌদ্ধ সাহিত্যের তিব্বতী ভাষায় অনুবাদ:

তিব্বতে বর্তমান লিপির উৎপত্তি ৭ম শতাব্দীতে হয়েছিল বলে মনে করা হয়। তিব্বতের ধর্মীয় রাজারা তাঁদের পৃষ্ঠপোষকতায় তিব্বতী এবং ভারতীয় পণ্ডিতদের একত্রিত করে বৌদ্ধ সূত্র, বিশেষ করে মহাযান গ্রন্থগুলিকে মূল সংস্কৃত থেকে তিব্বতী ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন। স্থানীয় মঠগুলিতে বৌদ্ধ সূত্র অধ্যয়ন এবং শিক্ষাদানের ঐতিহ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, যা সম্রাট স্রোংচান গাম্পোর রাজত্বকালে শুরু হয়েছিল। সংস্কৃত সাহিত্যের অনুবাদ সপ্তম শতাব্দী থেকে ত্রয়োদশ বা চতুর্দশ শতাব্দী পর্যন্ত প্রায় সাত থেকে আট শতাব্দী ধরে অব্যাহত ছিল। অধিকন্তু, বিংশ শতাব্দীতে, তিব্বতী পন্ডিত গেদুন্ ছোয়ফেল পবিত্র 'ধম্মপদ' গ্রন্থের পালি থেকে তিব্বতী ভাষায় প্রথম অনুবাদ করেন। প্রাথমিকভাবে, শুধুমাত্র ধর্ম, দর্শন এবং আধ্যাত্মিক অনুশীলনের সাথে সম্পর্কিত গ্রন্থগুলি অনুবাদ করা হয়েছিল। কালক্রমে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে, বৌদ্ধ দর্শন এবং আধ্যাত্মিক অনুশীলনের পাশাপাশি, অবদান, গাথা, পদ্য, নাটক, ব্যাকরণের বহু গ্রন্থের অনুবাদ এবং মঠের পাঠ্যক্রমের অন্তভুক্ত করা হয়।

দ্বাদশ শতাব্দীর পর, অনুবাদ প্রথা ধীরে-ধীরে বন্ধ হয়ে যায় এবং স্থানীয় পণ্ডিতরা কেবল গুরু-শিষ্য পরম্পরার মাধ্যমে পরবর্তী প্রজন্মে ঐ বিদ্যা হস্তান্তর করেন। শ্রবণ, মনন এবং আধ্যাত্মিক অনুশীলনের মাধ্যমে অর্জিত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে, তারা ভারতীয় মহা-আচার্যদের লেখা গ্রন্থের উপর ভাষ্য লিখতেও শুরু করেন, যা বিপুল সংখ্যায় তিব্বতী সুং-বুম সংকলনে সংরক্ষিত। ফলস্বরূপ, আমরা বর্তমানে তিব্বতী ভাষায় অনুবাদিত ভারতীয় গ্রন্থ ও তাঁদের ভারত ও তিব্বত উভয়ে দেশের পণ্ডিতদের দ্বারা লিখিত ভাষ্যের দ্বারা প্রায় সম্পূর্ণ মহাযান বৌদ্ধ বাঙময়ের অধ্যয়ন করতে পারছি। কালান্তরে, ভারতে বৌদ্ধ ধর্মের হ্রাস ও বিদেশী আক্রমণের ফলে বহু অমুল্য ভারতীয় পুঁথি ও গ্রন্থ আদি যা সংস্কৃত ভাষায় ছিল, তা বিলুপ্ত হয়ে যায়। বর্তমানে, ভারত ও বিশ্বের উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে তিব্বতী ভাষা ও সাহিত্যের মাধ্যমে ঐ বিলুপ্ত গ্রন্থগুলির পুনরুদ্ধারের প্রয়াস করা হচ্ছে।

বোধিসত্ত্ব অবদান-কল্পলতা:

বোধিসত্ত্ব অবদান-কল্পলতা বা সংক্ষেপে *অবদান-কল্পলতা* সংস্কৃত বৌদ্ধ সাহিত্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ। ঐ গ্রন্থের রচয়িতা একাদশ শতাব্দীর বিখ্যাত কাশ্মীরি পণ্ডিত ও কবি ক্ষেমেন্দ্র[৭]। ভারতবিদ্যার পণ্ডিত জন্ নৌডুর মতে ঐ গ্রন্থের রচনার সময়কাল আনুঃ ১০৫২ খ্রিস্টাব্দ। *অবদান-কল্পলতায়* মোট ১০৮ টি অধ্যায় রয়েছে। মনে করা হয় যে ক্ষেমেন্দ্র একশো-সাতটি অধ্যায় রচনা করেছিলেন। পরে, তাঁর পুত্র সোমেন্দ্র আর একটি অধ্যায় রচনা যোগ করে অধ্যায়ের মোট সংখ্যা ১০৮ টি করে দেন যা বৌদ্ধদের মতে একটি শুভ সংখ্যা।

গ্রন্থকার প্রতিটি অধ্যায়ে তথাগত বুদ্ধের অসামান্য শিক্ষার ও অনুশীলনের ব্যাখ্যা করেছেন। বিশেষ করে, বোধিসত্ত্বদের সম্যক অনুশীলন বা পারমিতার যথা দান, শীল, ক্ষান্তি, বীর্য, ধ্যান ও প্রজ্ঞার সুন্দর উপমার বর্ণনা পাওয়া যায়। তার সাথে বৌদ্ধ ধর্মের ধ্যান সাধনার বর্ণনাও পাওয়া যায়। এছাড়া, প্রাচীনযুগের সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা, নিয়মবিধি, ইতিহাস ও সংস্কৃতের ধারণাও পাওয়া যায়। সংক্ষেপে, *অবদান-কল্পলতা* গ্রন্থে ভগবান বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বদের গুণগুলি প্রতিটি অধ্যায় চমৎকার ভাবে বর্ণিত করা হয়েছে।

তিব্বতে *অবদান-কল্পলতারের* প্রসারের ইতিহাস:

সন ১২০৪ খ্রিস্টাব্দে, তিব্বতী 'লোচাবা'[৮] বা ধর্ম-অনুবাদক ঠোফু রিনছেন সেংগের[৯] আমন্ত্রণে কাশ্মীরের মহাপন্ডিত শাক্যশ্রী ভদ্র (১১২৭ খ্রিঃ–১২২৫ খ্রিঃ), নয়জন পন্ডিতদের সঙ্গে তিব্বতে আসেন। তিব্বতে তিনি তিব্বতী বৌদ্ধ সাক্যা শাখার[১০] প্রধান গুরু সাক্যা পন্ডিত[১১]-এর সংস্পর্শে আসেন এবং তাঁকে *অবদান-কল্পলতার* একটি সংস্কৃত পুঁথি উপহার দেন। পরবর্তীকালে, সাক্যা পণ্ডিতের ভ্রাতুষ্পুত্র ডোগোন ছোয়েগ্যাল ফাগপার আদেশানুসারে, সন্ ১২৬৯ খ্রিঃ তিব্বতী অনুবাদক শোংতোন দোর্জে গ্যালছেন এবং ভারতীয় পণ্ডিত লক্ষ্মীকর মাংয়ুল ক্যিদোয়ে মঠে ঐ গ্রন্থটি সংস্কৃত ভাষা থেকে তিব্বতী ভাষায় অনুবাদ করেন[১২]। তার পরের বছর গ্রন্থটি উভয় অনুবাদকদের দ্বারা আবার সংশোধিত হয়। *অবদান-কল্পলতার* শুধু অনুবাদই নয়, তিব্বতী লিপিতে এটির সংস্কৃত প্রতিলিপিকরণ বা 'Transliteration' ও করা হয়। প্রায় একই সময়ে, লোচাবা শোংতোন ভারতীয়

---

[৭] পণ্ডিত ক্ষেমেন্দ্রের জীবনী সম্পর্কে তথ্য খুবই সীমিত। *অবদানকল্পলতা* গ্রন্থের মুখবন্ধ ও সারাংশে তাঁর পুত্র সোমেন্দ্র কৃত কিছু তথ্য এবং কলহনের কৃত *রাজতরঙ্গিণী* গ্রন্থে তাঁর ব্যাপারে কিছু উক্তিই উপলব্ধ।

[৮] 'লোচাবা' শব্দটি সংস্কৃত শব্দ 'লোক চক্ষু'-এর অপভ্রংশ। এর আক্ষরিক অর্থ হল 'ব্রহ্মাণ্ডের নয়ন'। এটি তিব্বতী ধর্ম শাস্ত্রের অনুবাদকদের পদবি যারা সংস্কৃত ও তিব্বতী উভয় ভাষায় পারদর্শী এবং বৌদ্ধ ধর্ম আচারে নিপুণ।

[৯] রিনছেন সেংগে (রত্ন সিংহ) তিব্বতী নিংমা বৌদ্ধ শাখার একজন পণ্ডিত। তার জন্ম আনুমানিক ১১৭৩ খ্রিঃ তিব্বতের ঠোফু অঞ্চলে হয়েছিল।

[১০] তিব্বতে বৌদ্ধ ধর্মের চারটি প্রধান সম্প্রদায় হল- ঞিংমাপা, সাক্যাপা, কাগ্যুদ্পা ও গেলুগপা। সাক্যা সম্প্রদায়ের অনুগামীদের সাক্যাপা বলা হয়। 'সাক্যাপা'র নামকরণ স্থানের ভিত্তিতে হয়েছে। সন্ ১০৬৪ খ্রিস্টাব্দে পশ্চিম তিব্বতে খোন কোনছোগ গ্যালপো নামক এক মহাপুরুষের জন্ম হয়। তিনি সারমাপা ও ঞিংমাপা দুটি পরম্পরার বিষয়গুলি সমানভাবে অধ্যয়ন করেন। তিনি তাঁর গুরু ডোগ মী লোচাবা-র কাছ থেকে নালন্দার আচার্য ধর্মপাল ও আচার্য গয়াধরের দ্বারা প্রবর্তিত পরম্পরার মার্গ এবং ফল বিষয়ক উপদেশ শোনেন। পরবর্তীকালে তিনি সাক্যা নামক স্থানে একটি মঠ প্রতিষ্ঠা করেন এবং সেখানে নিজের মতবাদগুলি প্রচার করেন। তাঁর মতের দ্বারা এবং পরবর্তীকালে সাক্যা গোংমা দ্বারা প্রভাবিত অনুগামীদের সাক্যা বলা হয়।

[১১] তিব্বতী বৌদ্ধ সাক্যা সম্প্রদায়ের পাঁচ প্রধান গুরু- ১) সাছেন কুংগা ন্যিংপো, ২) সোনাম ছেমো, ৩) জেছুন ডাকপা গ্যাল্ছেন, ৪) সাক্যা পণ্ডিত, ৫) ছোয়গ্যাল ফাগ্পা।

[১২] *বোধিসত্ত্বাবদানকল্পলতার* তিব্বতী অনুবাদের নাম 'জাংছুব সেম্পে তোগজোয়ে পাগ্সাম ঠিশিং'। গ্রন্থটি বর্তমানে তিব্বতী বৌদ্ধ শাস্ত্রের সংকলন তেঞ্জুরে সংরক্ষিত।

পণ্ডিত দণ্ডি কৃত *কাব্য-দর্শ* ও রাজা হর্ষবর্ধন *নাগানন্দ* নাটকের অনুবাদও করেন। সুতরাং, এটা বলা যেতে পারে যে *অবদান-কল্পলতার* অধ্যয়ন তিব্বত দেশে ১২ শতাব্দী থেকেই সাক্যা পণ্ডিত দ্বারা শুরু গেছিল।

তিব্বতীবিদ শরৎচন্দ্র দাসের মতে, *অবদান-কল্পলতা* প্রথমে তিব্বতী পাঠ্যক্রমে বিশেষ স্বীকৃতি পায়নি। এমনকি ঐ গ্রন্থটিকে অনেকে ভগবান বুদ্ধের অবদান হিসেবে গ্রহণ করতেও অনিচ্ছুক ছিলেন, কারণ রচয়িতা ক্ষেমেন্দ্র একজন মহা পণ্ডিত হওয়া সত্ত্বেও গৃহস্থের জীবন কাটাতেন। সে সময় এমন বিশ্বাস ছিল যে কূলে ব্রাহ্মণ হওয়ায় তিনি বৌদ্ধ ধর্ম ও দর্শনের ব্যাপারে বিশেষ অবগত ছিলেন না। এইরূপ বিশ্বাসের কারণ জানতে হলে সেই যুগে তিব্বতের জনগণের মানসিকতাটা বোঝা আবশ্যক। তিব্বতে বৌদ্ধ ধর্মের প্রবেশ (সপ্তম শতাব্দী) থেকে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত সংস্কৃত বাঙময়ের যেকয়টি গ্রন্থ অনুবাদিত হয়েছিল, সেগুলি শুধু আধ্যাত্মিক বিদ্যার, যেমন ধর্ম, দর্শন ও সাধনার গ্রন্থ। সুতরাং অবদান কল্পলতা প্রভৃতি গ্রন্থকে প্রাথমিকভাবে সবাই গ্রহণ করতে পারেনি। এটি বোধিসত্ত্বদের অবদান সংকলন হওয়ার সাথে-সাথে কাব্যিক দৃষ্টিতেও অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি রচনা। পরবর্তীকালে, তিব্বতী মঠগুলিতে শব্দ-বিদ্যার অন্তর্গত বিভিন্ন বিষয়ে অধ্যয়নে বৃদ্ধির ফলে কাব্যচর্চা একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে হয়ে ওঠে। ফলস্বরূপ, '*অবদান-কল্পলতা*' পাঠ্যক্রমে বিশেষ স্বীকৃতি লাভ করে।

অবদান-কল্পলতার তিব্বতী অনুবাদের সংশোধন:

বোধিসত্ত্ব অবদান-কল্পলতার তিব্বতী সংস্করণের মূল সংস্কৃত গ্রন্থের সাথে মিল রেখে মোট দুইবার সংশোধন করা হয়েছিল। প্রথম সংশোধনটি করেছিলেন শালু লোছেন ছোয়েক্যোং সাংপো (১৪৪১ খ্রিঃ–১৫২৭ খ্রিঃ) সংস্কৃত গ্রন্থের সাথে তুলনা করে। দ্বিতীয়বার, পঞ্চম তালাই লামার শাসনকালে, বিখ্যাত অনুবাদক দারপা লোচাবা ঙাগ-বাং গ্যাৎসো (আনুঃ সপ্তদশ শতাব্দী) সম্পূর্ণ গ্রন্থটি সংশোধন করেন। স্বয়ং তালাই লামা এই কাজটি অনুমোদন করেছিলেন। বিংশ শতাব্দীর মহান পণ্ডিত ও পরিব্রাজক গেদুন ছোয়েফেলও *অবদান-কল্পলতার* তাৎপর্য তাঁর গ্রন্থে বহুবার উল্লেখ করেছেন। তিনি ঐ গ্রন্থের সংশোধনের প্রয়াস করেন।

অবদান-কল্পলতার উপর তিব্বতী ভাষ্য:

অবদান-কল্পলতার উপর প্রাচীনতম ভাষ্যকার হলেন লোচাবা লোডোয়ে তেনপা (১২৭৬–১৩৪২ খ্রিঃ), যিনি '*অবদানের টিপ্পনী* নামক ভাষ্যটি রচনা করেছিলেন[১৩]। এছাড়া শোতোন জিগমে ডাকপার কৃত টীকা '*নাগছেন*' (অনু. কালো টীকা), রিনপুং জিগডাকের রচিত *মারছেন* (লাল টীকা) উভয়ই অতি প্রসিদ্ধ ভাষ্য। এছাড়া আরও দুটি টীকা পাওয়া যায় যার রচয়িতার নাম এখনও অজ্ঞাত। শুধু ভাষ্যই নয়, তিব্বতী শিল্পী ও ভাস্করদের করা অবদানগুলির অসামান্য দেওয়াল-চিত্র ও ভাস্কর্য আজও তিব্বতের বহু মঠ ও স্তুপে বিদ্যমান। এই গ্রন্থের প্রতিটি পল্লবের চিত্রপট তিব্বতী চিত্রকরেরা তিব্বতী 'থাংকায়' প্রদর্শিত করেছেন। সুতরাং, সাহিত্য ও কাবিত্ব বিদ্যা সহ শিল্প বিদ্যাও ঐ গ্রন্থের প্রভাব দেখতে পাওয়া যায়।

ভারতে *অবদান-কল্পলতার* পুনরুদ্ধার:

ত্রয়োদশ শতাব্দীতে *অবদান-কল্পলতার* মূল সংস্কৃত গ্রন্থ ও তার পঠনপাঠনের পরম্পরা ভারতবর্ষ থেকে প্রায়ই লুপ্তই হয়ে গেছিল। সন্ ১৮৮২ সালে, তিব্বতীবিদ ও ব্রিটিশ গুপ্তচর শরৎচন্দ্র দাস তিব্বতের রাজধানি লহাসায় নার্থাং তেংগ্যুরে[১৪] *অবদান-কল্পলতার* তিব্বতী সংস্করণের সন্ধান পান এবং তা ভারতে নিয়ে আসেন। পরে

---

[১৩] লোচাবা লোডোয়ে তেনপা *অবদান কল্পলতার* ভাষ্য ছাড়া *কালচক্র, কলাপ ব্যাকরণ* এবং *কাব্য-দর্শের* ভাষ্য রচনা করেন।

[১৪] তিব্বতী অনুবাদক 'লোচাবা' এবং ভারতীয় পণ্ডিতদের দ্বারা যে বিপুল পরিমাণ মহাযানি বৌদ্ধ শাস্ত্র সংস্কৃত ভাষা থেকে তিব্বতী ভাষায় অনুবাদিত হয়, সেগুলি বৌদ্ধ ধর্মের বিভিন্ন বিষয় অনুসারে *কাংগ্যুর* ও *তেংগ্যুর* সংস্করণে সংকলিত করা হয়। '*কাংগ্যুর*

তিনি বই আকারে সংস্কৃত সংস্করণ সহ সম্পাদনা করে এশিয়াটিক সোসাইটি থেকে ১৮৮৮ সালে প্রকাশ করেন। তিনি গ্রন্থটির বাংলা অনুবাদও করেছিলেন। পি এল বৈদ্য, এর সংস্কৃত সংস্করণটি সংশোধন ও সম্পাদনা করেন, যা মিথিলা ইন্সটিটিউট থেকে ১৯৮৯ সালে প্রকাশিত হয়।

তিব্বতী বৌদ্ধ ধর্ম ও সাহিত্যে *অবদান-কল্পলতার* প্রভাব:

উপরোক্ত তথ্যের উপর ভিত্তি করে, এটা বলা যেতে পারে যে তিব্বতে বৌদ্ধ দর্শন অধ্যয়নের উপর *বোধিসত্ত্ব অবদান-কল্পলতা* গ্রন্থটি গভীর প্রভাব বিস্তার করেছে। এর প্রধান কারণ হল ঐ গ্রন্থটি সংস্কৃত কাব্যিক শৈলীর মাধ্যমে ভগবান বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বদের চর্যা বা পারমিতাগুলি স্পষ্টভাবে প্রকাশিত করেছে। এর পাশাপাশি, *অবদান-কল্পলতা* গ্রন্থটি উৎকৃষ্টমানের কাব্যরস, অলংকার, ছন্দ ইত্যাদি গুণসম্পন্ন একটি রচনা যা বোধগম্য করাও সহজ। বহু তিব্বতী পণ্ডিতদের মতে এই গ্রন্থটি হল তিব্বতে অনুদিত সকল সংস্কৃত গ্রন্থের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। বৌদ্ধ মঠের পাথ্যক্রমেও এটি দণ্ডির *কাব্য-দর্শে* পরে কাব্য ও ছন্দ বিদ্যার একটি আদর্শ পাঠ্য হিসাবে গৃহীত হয়েছে। সূক্ষ্ম পরীক্ষণ করলে দেখা যাচ্ছে যে *বোধিসত্ত্ব অবদান-কল্পলতার* জনপ্রিয়তা তিব্বতে ১৩ শতাব্দীর পর থেকে প্রবল ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। তিব্বতে ও ভুটানে অতি জনপ্রিয় নাট্যধারা হল 'লহামো' বা 'আচে লহামো'। এই নাটকগুলির মূল কাহিনী প্রধানত প্রাচীন ভারতীয় বৌদ্ধ লোককথা, গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের জীবন এবং তিব্বতী সভ্যতার ঐতিহাসিক ঘটনা থেকে নেওয়া। ফলস্বরুপ, '*অবদানকল্পলতা*' গ্রন্থের বিভিন্ন অবদান থেকে অনুপ্রাণিত চিত্রনাট্যও বিভিন্ন তিব্বতী অনুষ্ঠানে পরিবেশিত হয়।

উপসংহার

কালান্তরে, ভারতে বৌদ্ধ ধর্মের হ্রাসের ফলে, বহু মহাযানি সংস্কৃত বৌদ্ধ শাস্ত্রের সাথে *বোধিসত্ত্ব অবদান-কল্পলতাও* বিলুপ্ত হয়ে যায়। ঐসব গ্রন্থের অধ্যয়ন পরম্পরাও ক্রমে ভারত থেকে লুপ্ত হয়ে যায়। সৌভাগ্যবশত, তিব্বতে এই গ্রন্থগুলির তিব্বতী ভাষায় অনুবাদ এবং লিপান্তর করায় আজ মূল সংস্কৃত পাঠ সহ বাকি বহু ভাষায় এগুলির অনুবাদ করা হচ্ছে। তিব্বতী গ্রন্থগুলির চৈনিক মাঞ্চু এবং মঙ্গোলীয় ভাষায় বিপুল পরিমাণে অনুবাদিত করা হয়েছে যেগুলি আজও বিদ্যমান। এছাড়া শুধু গ্রন্থগুলির অধ্যয়নই নয়, এই গ্রন্থগুলির শিক্ষা ও সাধনা বিধি তিব্বতী পণ্ডিত ও সাধকদের দ্বারা বাস্তবেও প্রচলিত ছিল। বর্তমানে, ভারতে ও বিশ্বের অন্যান্য খ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়ে বৌদ্ধ বিদ্যা বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, এবং প্রায় বেশীরভাগেই ঐসব মহাযানি গ্রন্থের অধ্যয়ন ও গবেষণা করা হয়। *অবদানকল্পলতার* তিব্বতী, মাঞ্চু ও মঙ্গোলীয় ভাষা ছাড়া বর্তমানে বাংলা, হিন্দি এবং ইংরেজি ভাষায়ও অনুবাদিত হয়েছে। ঐ গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ ১৯১২ সালে শ্রী শরৎচন্দ্র দাস তিব্বতী সংস্করণ থেকে করেন। ১৯৯৭ সালে গ্রন্থটি ইংরেজি ভাষায় অনুবাদ করেন শ্রীমতী ডেবোরা ব্ল্যাক।

।।ভবতু সর্বমঙ্গলম্।।

Bibliography:

1. Beal, S. (1969). *Buddhist Records of the Western World.* Delhi.
2. Black, D. (1997). *Leaves of Heaven Tree.* Dharma Publishing.
3. Chattopadhyay, A. (2018). *Atisa Dipankar Srigyan.* Kolkata: Anushtup.
4. Chaudhury, S. (2021). *Gautam Buddher Dharma o Darshan.* Kolkata: Mahabodhi Society.
5. Das, S. C. (1940). *Avadāna Kalpalatā.* Calcutta: Royal Asiatic Society of Bengal.
6. Das, S. C. (1940). *Avadāna Kalpalatā.* Calcutta: Royal Asiatic Society of Bengal.

সংস্করণে ভগবান বুদ্ধর সকল বচন সংরক্ষিত এবং '*তেংগ্যুরে*' ভারতীয় পণ্ডিতদের দ্বারা বুদ্ধবচনের ওপর প্রণীত টীকা-সংগ্রহ সংরক্ষিত আছে।

7. Dutt, N. (2024). *Mahāyāna Buddhism.* Delhi: Bharatiya Kala Prakashan.
8. Kaul, A. (2014). Formation of Buddhist Sanskrit Literature in Kashmir and its Dissemination Abroad. *Kriti Rakshana, Vol 9* , 16-18.
9. Lama), T. G. (2007). *Opening the Mind and Generating a Good Heart.* Dharamsala: Library of Tibetan Works and Archives.
10. Negi, R. L. (2018). *Vāk Pradīp.* Sarnath: Kagyud Relief and Protection Committee.
11. Pathak, S. (1974). *The Indian Nītiśāstras in Tibet.* Delhi: Motilal Banarasidass.
12. Sankritayan, R. (2012). *Tibbat mein Boudh Dharam.* Delhi: Kitam Mahal.
13. Singh, K. S. (2007). AVADANA KALPALATA- A CULTURAL STUDY. Aligarh: Dept. of Sanskrit, Aligarh Muslim University.
14. Vaidya, P. (1959). *Avadāna-Kalpalata of Ksemendra, Vol. I.* Darbhanga: The Mithila Institute.